গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১৩ সংখ্যা | ৮ - ১৪ নভেম্বর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

কাশ্মীরে পাঁচ শ্রমিকের হত্যা কেন্দ্রীয় সরকারের দাবিকে নস্যাৎ করল

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামে ২৯ অক্টোবর সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা পাঁচজন পরিযায়ী শ্রমিকের হত্যার ঘটনার নিন্দা এবং তাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে ১ নভেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নের বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

কাশ্মীরের কুলগামে সন্ত্রাসবাদীরা যেভাবে পাঁচজন পরিযায়ী শ্রমিককে হত্যা করেছে তাতে সমগ্র বিশ্বের সাথে আমরাও গভীরভাবে মর্মাহত। ৩৭০ ধারা রদ করার পরেও কাশ্মীর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক— কেন্দ্রীয় সরকারের এই দাবিকে এক ধাক্কায় নস্যাৎ করে দিল কুলগামের হত্যাকাণ্ড। আরও একটি সত্য প্রকাশ পেল যে, বাঁচার তাগিদে কাশ্মীরে যাওয়া দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবনের কোনও নিরাপত্তাই নেই। জম্মু-কাশ্মীর এখন পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। ফলে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের জন্য অন্যান্য রাজ্যের যে শ্রমিকরা কাশ্মীরে যেতে বাধ্য হন তাঁরা সহ কাশ্মীরের জনগণকে নিরাপদে রাখার পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারেরই। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ।

সরকারের দাবিকে নস্যাৎ করে এই ঘটনা প্রমাণ করল সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরে পুরোপুরি সক্রিয়। বস্তুত কেন্দ্রীয় কমিটির ৬ আগস্টের বিবৃতিতে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলাম, "যখন দরকার ছিল ৩৭০ ধারাকে পুরোপুরি কার্যকর করার মাধ্যমে কাশ্মীরী জনগণের আস্থা অর্জন করা এবং পাকিস্তানের মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও পরাজিত করা, সেই সময় এই একতরফা ৩৭০ ধারা রদের ঘোষণা কাশ্মীরের জনগণকে শুধু আরও দূরে ঠেলে দেবে তাই নয়, একই সাথে এই পদক্ষেপ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি করবে।" গভীর দুঃখের হলেও এ কথা বলতে হচ্ছে যে, নিরীহ শ্রমিকদের পৈশাচিক হত্যা আমাদের সেই আশঙ্কাকেই সত্য প্রমাণ করল।

নিহত শ্রমিক পরিবারগুলির প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাই। সরকারের কাছে আমাদের দাবি, এই পরিবারগুলির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং সক্ষম সদস্যদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবিতে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

মানুষের দাবিতে ১৩ নভেম্বর

রাজপথ ভাসবে মিছিলে

গণআন্দোলনের প্রবল চাপে প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সম্প্রতি রাজ্য সরকার পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালুর ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। সঠিক দাবি, যোগ্য নেতৃত্ব এবং ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে আদায় সম্ভব, তা আবারও প্রমাণিত হল।

এই জয়ের উপর দাঁড়িয়েই জনজীবনের জ্বলন্ত অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে আন্দোলন আরও তীব্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। ডাক দিয়েছে ১৩ নভেম্বর নবান্ন ও উত্তরকন্যা অভিযান এবং রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচির। সারা রাজ্য থেকে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ সহ জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে হাজার হাজার মানুষ সেদিন নিজ নিজ জীবনের দাবি নিয়ে সমবেত হবেন কলকাতার হেদুয়া পার্কে। এরই প্রস্তুতি চলছে রাজ্য জুড়ে। প্রচার চলছে চাষির খেতে, শ্রমিকের কারখানায়, হাটে-বাজারে-স্টেশনে-গ্রামে-শহরে সর্বত্র। সেদিন কৃষকরা উপস্থিত হবেন ফসলের ন্যায্য দামের, সার-বীজ-তেল-জল-বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবি নিয়ে। অসংগঠিত শ্রমিকরা আসবেন ন্যূনতম মজুরি, কাজের স্থায়িত্ব আর নিরাপত্তার দাবি নিয়ে। মহিলারা আসবেন তাঁদের উপর বেড়ে চলা নির্যাতন, খুন ধর্ষণের প্রতিকার চেয়ে। চা-বাগান থেকে শ্রমিকরা আসবেন তাঁদের উপর মালিকী শোষণ-জুলুমের প্রতিকার আর ন্যায্য মজুরির দাবি নিয়ে। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল কর্মী, আইসিডিএস এবং পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা আসবেন তাঁদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম মজুরির দাবি নিয়ে। ছাত্ররা আসবে বিজ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাকে ধ্বংসের এবং বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ জানিয়ে। যুবকরা আসবেন তাঁদের যোগ্যতার উপযুক্ত কাজের দাবি নিয়ে। মূল্যবৃদ্ধি-বেকারি-শোষণ-বঞ্চনার জ্বালায় জ্বলতে থাকা হাজার হাজার মানুষের দৃপ্ত পদসঞ্চার, উচ্চকিত স্লোগান তুলবে গণআন্দোলনের নতুন ঢেউ। দাবি উঠবে, 'মুখ্যমন্ত্রী দাবি মানো'। রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে স্লোগান উঠবে, 'মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরির ষড়যন্ত্র এনআরসি চালুর পরিকল্পনা বাতিল করো'।

শোষিত মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই ধরতে পারছে, বছর বছর ভোট দিয়ে সরকার বদলে, শাসকের রঙ বদলে জীবনের দুর্দশা ঘুচবে না। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) তার দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরে দেখাচ্ছে, শাসকরা শোষিত মানুষকে বঞ্চনা-প্রতারণা ছাড়া আর কিছু দেবে না। শ্রমজীবী তথা সাধারণ মানুষ সমাজের সমস্ত সম্পদের স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও যুগে যুগে শাসকরা সাধারণ মানুষকে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু থেকেও বঞ্চিত করে এসেছে। সাধারণ মানুষ তাদের থেকে যা কিছু আদায় করেছে তা লড়াই করে, রক্ত ঝরিয়ে— অনিচ্ছুক শাসকরা এমনি এমনি কিছু দেয়নি, কোনও দিন দেবেও না। আজও বেঁচে থাকার ন্যায্য দাবি, তা সে মূল্যবৃদ্ধি রোধ হোক, কাজের দাবি হোক, ন্যায্য মজুরি হোক, মহিলাদের উপর নির্যাতন রোধই হোক কিংবা এনআরসি বাতিলের দাবি— যদি শাসক শ্রেণির কাছ থেকে এগুলি আদায় করতে হয় তবে সংগঠিত আন্দোলনই একমাত্র রাস্তা। প্রাথমিকে ইংরেজি চালুর দাবি আদায় কিংবা পাশ-ফেল চালু, বিদ্যুতের নানা সমস্যার প্রতিকার, স্কুল-কলেজে ফি বৃদ্ধি রোধ এবং অন্য বহু দাবি যা আদায় হয়েছে, তার কোনওটিই ভোট দিয়ে সরকার পাল্টে আদায় হয়নি, এমএলএ-এমপি-র সংখ্যা দিয়েও হয়নি, হয়েছে গণআন্দোলনের রাস্তায়। তাই আসুন, নিজেদের জীবনের দাবিগুলি আদায়ের আন্দোলনকে তীব্রতর করতে ১৩ নভেম্বর সুবিশাল এই মিছিলে পা মেলাই।

দেশপ্রেমের ঢাক পিটিয়ে খিদের জ্বালা ভোলাতে পারল না বিজেপি

লোকসভা ভোটে অভাবনীয় সাফল্যের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে বিরাট ধাক্কা খেল বিজেপি।

এবারের লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে ২৮৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২০০-র বেশি এবং হরিয়ানায় ৯০টির মধ্যে ৭৯টি আসনে এগিয়েছিল বিজেপি। তাই সদম্ভে তারা ঘোষণা করেছিল, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দুটি রাজ্যেই সরকারে ফিরছে তারা। কিন্তু কোনও রাজ্যেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পায়নি বিজেপি। মহারাষ্ট্রে পেয়েছে ২৮৮টির মধ্যে ১০৫টি এবং হরিয়ানায় ৯০টির মধ্যে ৪০টি আসন। স্বাভাবিক প্রশ্ন, এত অল্প সময়ে জনসমর্থনে এত ধস নামল, নাকি পরিবর্তনটা অনেক আগে থেকেই ঘটছিল?

এবারের লোকসভা নির্বাচনের মাস পাঁচেক আগেই চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তিনটি রাজ্যে ক্ষমতা হারিয়েছিল বিজেপি— মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে। তেলেঙ্গানাতেও ফল হয় শোচনীয়। স্বাভাবিক ভাবেই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভবিষ্যত নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠে যায়। সাধারণ মানুষের আলোচনায় উঠে আসে— লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি আর আদৌ ক্ষমতায় ফিরতে পারবে কি না?

এই আলোচনা ভিত্তিহীন ছিল না। কারণ ২০১৪ সালে ক্ষমতায় বসার আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি কোনওটিই বিজেপি পূরণ করেনি। মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া হয়েছিল। কালো টাকা উদ্ধার

দুয়ের পাতায় দেখুন

এনআরসি প্রতিরোধে নাগরিক কমিটি গঠিত হল

৪ নভেম্বর কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে এনআরসি বিরোধী নাগরিক কনভেনশনে উপচে পড়া ভিড়। হলের বাইরেও ছিলেন বহু মানুষ। বিস্তারিত সংবাদ আটের পাতায়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের তীব্র বিরোধিতা ডিএসও-র

নিরাপত্তারক্ষীদের 'গাফিলতি' বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের চোখে পড়ায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী চেয়ে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছেন— এই খবর ছড়ানোর পরেই স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেছে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। সরব হয়েছেন আরও অনেকে।

ওই চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, বেসরকারি সংস্থার রক্ষীরা বিশ্বভারতীর নিরাপত্তা আধিকারিকের নির্দেশ মান্য করেন না। এর ফলে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। উপাচার্যের এই চিঠি পাঠানো নিয়ে শোরগোল পড়েছে বিশ্বভারতীতে। বিশ্বভারতীর মতো আশ্রমিক প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই। ডিএসও-র সদস্যেরা ভাষাভবন, বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রচার চালান। তাঁদের বক্তব্য, সিআইএসএফ দিয়ে বিশ্বভারতীকে জেলখানা বানানো চলবে না। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা কি জঙ্গি? তাহলে সিআইএসএফ কেন? ক্যাম্পাসের মধ্যে বন্দুকধারী সিআইএসএফ কখনওই মানা যায় না। গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলন দমন করতেই কি সিআইএসএফ আনার পরিকল্পনা?

এআইডিএসও-র বিশ্বভারতী কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, বিভিন্ন সময় ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ মনে করছেন, সেই ন্যায্য দাবির আন্দোলনে নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীরা ঠিক ভাবে কাজ করছেন না। তাই ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনকে দমন করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডেকে আনা হচ্ছে। কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই ধরনের আধা সামরিক বাহিনী বা বন্দুকধারী পুলিশ রেখে পঠনপাঠন চলবে, তা মানা যায় না।

চলতি শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে উপাচার্য সহ অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের ঘেরাও করে রাখেন ছাত্রছাত্রীরা। সেই সময় বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরা নিজেদের কর্তব্য পালন করেননি বলে অভিযোগ ওঠে। এ ছাড়াও বিশ্বভারতীতে নানা আন্দোলনের জেরে ঘেরাও হতে হয়েছে উপাচার্য ও আধিকারিকদের। এই সব কারণেই কি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছেন উপাচার্য, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বিশ্বভারতী জুড়ে।

জীবনাবসান

কোচবিহার জেলার গোপালপুর অঞ্চলের বুড়াবুড়ি গ্রামের এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড রবীন্দ্রনাথ ডাকুয়া দীর্ঘ অসুস্থতার পর ২৫ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

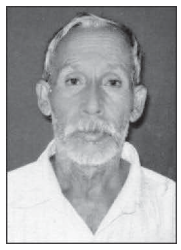

তিনি নিম্নবিত্ত চাষি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং কর্মসূচিতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ধীরে ধীরে পরিবারের সকলকে দলের সঙ্গে যুক্ত করেন। বিরোধী দলের নানা প্রলোভন এবং চরম দারিদ্র উপেক্ষা করে বলিষ্ঠতার সঙ্গে দলের প্রচার করা, দলের বৈপ্লবিক চিন্তাকে পাথেয় করে এগিয়ে চলার নজির সৃষ্টি করেছিলেন তিনি।

৩০ অক্টোবর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমরেড ডাকুয়ার বিভিন্ন গুণের দিক তুলে ধরেন কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নৃপেন কার্যী। কর্মী-সমর্থক সহ স্থানীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড রবীন্দ্রনাথ ডাকুয়া লাল সেলাম

হোস্টেল কর্মচারীরা আন্দোলনে

নদিয়া জেলার অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের অধীন অস্থায়ী হোস্টেল কর্মচারীরা বোনাস এবং স্বাস্থ্য বিমা ও অবসরকালীন পেনশন ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বল্প মজুরিতে ছুটিবিহীন কাজ করে চলেছেন। হোস্টেলের ছোট ছোট শিশুদের জন্য রান্না করা, তাদের স্নান করানো-খাওয়ানো, এমনকি রাতে ঘুম পাড়ানোর মতো কাজ সারাদিন করে যেতে হয় স্বল্প মজুরির বিনিময়ে।

২৪ অক্টোবর দুর্যোগকে উপেক্ষা করে নদিয়া জেলাশাসকের উদ্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন স্মারকলিপি দেয়। গ্রহণ করেন জেলা উন্নয়ন আধিকারিক। তিনি সহমর্মিতার সাথে দ্রুত আর্থিক বঞ্চনা নিরসন ও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে মজুরি দেবার মৌখিক আশ্বাস দেন। ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমরেড সুনির্মল দাস এবং নদিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ ব্যানার্জী সহ গোবিন্দ রায় ও মধুসূদন প্রামাণিক ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন।

কিশোর শিবির

কলকাতা ঃ ১৯-২০ অক্টোবর চেতলার কৈলাস বিদ্যামন্দির স্কুলে কমসোমলের কলকাতা জেলার উদ্যোগে কিশোর শিবির অনুষ্ঠিত হল। ২২টি ইউনিট থেকে শতাধিক শিশু-কিশোর অংশ নিয়েছিল। শিবিরের সূচনা করেন কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী। বড় মানুষদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং সত্য পথে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

শিবিরের প্রথম দিন হাতের লেখা ও সঙ্গীত কর্মশালা ও সিনেমা প্রদর্শনী হয়। দ্বিতীয় দিনে শরীরচর্চা, নাটক ও নাচের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

হুগলি ঃ ২০ অক্টোবর হুগলি জেলা কমসোমলের পক্ষ থেকে মিলন আসরের আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন ইউনিট থেকে শিশু-কিশোররা গান, আবৃত্তি, নাটক পরিবেশন করে। মহান মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবর্ষ উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাবলি পাঠ ও তাঁর জীবনী বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী ও স্লাইড শো হয়। উপস্থিত ছিলেন কমসোমলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুদর্শন মান্না ও দলের জেলা নেতৃবৃন্দ।

খিদের জ্বালা ভোলাতে পারল না বিজেপি

একের পাতার পর

দূরের কথা, হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক দুর্নীতিতে বিজেপি নেতাদের যোগসাজশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বছরে দু'কোটি বেকারের কাজের সংস্থান দূরের কথা, লাখে লাখে শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারাচ্ছিল। ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে কৃষকদের আত্মহত্যা ক্রমাগত বাড়ছিল। বাড়ছিল রাজ্যে রাজ্যে কৃষক বিক্ষোভ। মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে এমনই এক কৃষক বিক্ষোভে বিজেপি সরকার গুলি চালিয়ে ছ'জন কৃষককে হত্যা করে। 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগানকে ব্যঙ্গ করে দেশজুড়ে নারী নির্যাতন বেড়েই চলছিল। নোট বাতিল সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগে ফেলেছিল। ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে শতাধিক সাধারণ মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল। তড়িঘড়ি জিএসটি চালু করায় ছোট ও মাঝারি কয়েক লক্ষ সংস্থা-শিল্প-ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছিল। ফলে বিজেপি শাসনের বিরুদ্ধে জনরোষ ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিল শাসক শ্রেণি। কারণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তখনও অটুট। অথচ রাজ্যে রাজ্যে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলি বেড়েই চলেছে। তা হলে উপায় কী? উপায় ক্রমাগত জাতীয়তাবাদকে চাগিয়ে তোলা। তার জন্য শত্রু খাড়া কর পাকিস্তানকে। তাই পুলওয়ামা, বালাকোট। সরকার, প্রশাসন, পুঁজিপতিদের টাকার থলি আর তাদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যম একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতীয়তাবাদের জিগির তুলতে। অসহায় মানুষ আরও একবার শাসক শ্রেণির পাতা ফাঁদে পা দিল। বিপুল ভোটে দ্বিতীয়বারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গদিতে বসলেন পুঁজিপতিদের নয়নমণি নরেন্দ্র মোদি।

পুঁজিবাদী এই শাসনব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার লক্ষ্য নিয়ে যে দলই সরকারি ক্ষমতায় বসুক, প্রতারণা ছাড়া জনগণকে তাদের আর কিছুই দেওয়ার নেই। গত সাত দশকের ভোট-রাজনীতির ইতিহাস তার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। এবারও তাই ঘটল। উগ্র জাতীয়তাবাদের ঘোর কাটতেই মানুষ টের পেল বিজেপি তাদের আবার প্রতারিত করেছে। জাতপাত-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ বাড়িয়ে তোলা ছাড়া এই সরকারের ঝুলিতে আর কিছুই নেই। বেকারি, মূল্যবৃদ্ধির গায়ে স্পর্শও করতে পারেনি সরকার। কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার কোনও ইচ্ছে সরকারের নেই। সরকারি মদতে সংখ্যালঘু এবং দলিতদের উপর আক্রমণ ঘটেই চলেছে। এই অবস্থায় দুটি রাজ্যেই মানুষের রায়ে প্রমাণ হল, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রতি দেশের মানুষের সমর্থন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দেশপ্রেমকে অত্যন্ত চাতুরির সাথে ব্যবহার করে এই সমর্থন বিজেপি আদায় করে নিয়েছিল। অর্থাৎ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এখন চুরি করা আয়ুতে টিকে আছে।

এই অবস্থায় বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম আবার নেমে পড়েছে— বিজেপির প্রতি মানুষের এই ক্ষোভকে কংগ্রেসের পক্ষে টেনে নিয়ে যেতে। মুমূর্ষু কংগ্রেসকে অক্সিজেন জোগাতে নেমে পড়েছে পুঁজিপতিদের একটি অংশ। তাদের লক্ষ্য দেশে একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করা। পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থরক্ষাকারী বিশ্বস্ত দুটি দলকে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে চায় তারা। যখন একটি দলের অপশাসনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে মানুষ, তখন অন্য দলটিকে প্রচার দিয়ে দিয়ে তারা মানুষের সামনে নিয়ে আসবে। আবার এই দলটি ক্ষমতায় গিয়ে যখন একই কাজ করতে থাকবে এবং ক্ষুব্ধ মানুষ একদিন তাকেও ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তখন ঠিক একই কায়দায় অন্য দলটিকে প্রচার দিয়ে সামনে নিয়ে আসবে। ইউরোপ আমেরিকার বনেদি পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবস্থাই সেখানকার একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা কায়েম রেখেছে। এতে পুঁজিপতি শ্রেণি নিশ্চিন্তে জনগণের উপর তাদের শাসন শোষণ কায়েম রাখতে পারে।

কিন্তু জনগণ কি নীরবে এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে শোষিত এবং প্রতারিত হতেই থাকবে? তারা কি পুঁজিপতি শ্রেণির এই স্থায়ী শোষণ-অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজবে না? তারা কি ভেবে দেখবে না, কী সেই উপায় যা তাদের এই পুঁজিবাদী যাঁতাকল থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে পারে? বাস্তবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ শোষক ও শোষিত— এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এই ব্যবস্থায় দল মানেই কোনও একটি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দল। জনগণের স্বার্থরক্ষার নাম নিয়ে যে দলগুলি কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে শাসন চালাচ্ছে সেগুলি আসলে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী দল। তাই এদের শাসনে জনগণের দুর্ভোগ বাড়তেই থাকে আর পুঁজিপতিরা নিশ্চিন্তে তাদের শোষণ চালিয়ে যায়।

জনগণ যখন সংকটে হাবুডুবু খেতে থাকে তখনও তাদের মুনাফা বেড়েই চলে। এই অবস্থায় শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী শ্রেণিদল কোনটি তা চিনে নেওয়া জরুরি। কারণ শোষক শ্রেণির নানা অংশের স্বার্থরক্ষাকারী অনেকগুলি দল থাকলেও শোষিত শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দল একটিই। সেই দলকে ক্রমাগত শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই একমাত্র শাসক শ্রেণির শোষণ এবং প্রতারণার রাজনীতিকে পরাস্ত করা সম্ভব।

মার্কসবাদ বলতে লেনিন বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি বুঝেছিলেন

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান কথাটার মানে হচ্ছে, সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাপ্রক্রিয়া। এটা আয়ত্ত করার ব্যাপারটা শুধুমাত্র একজন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না, বরং একজন মানুষের বুদ্ধি কীভাবে প্যাটার্নড হবে, অর্থাৎ কোন ধাঁচায় গড়ে উঠবে, সেটা নির্ভর করে সেই বিশেষ মানুষটির চিন্তাপ্রক্রিয়ার উপর। যেমন, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের দৃষ্টান্তই ধরুন। যাঁরা ট্রটস্কি, বুখারিন বা তাঁদের শিবিরের অন্যান্যদের মতাবলম্বী ছিলেন, অথবা, পরবর্তীকালে যাঁরা ক্রুশ্চেভের কট্টর সমর্থক ছিলেন, তাঁরা অতি সহজেই বিশ্বাস করেছেন ও জোর গলায় বলেছেন যে, স্ট্যালিন সোভিয়েট ইউনিয়নের অপরিমেয় ক্ষতি করে গেছেন। এমন কথাও তাঁরা বলেছেন যে, স্ট্যালিনের মতো 'ধুরন্ধর শয়তান' আর হয় না। অন্য দিকে, যাঁরা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামী ছিলেন, লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে যাঁদের দ্বিধাহীন আস্থা ও আনুগত্য ছিল, তাঁদের ট্রটস্কির ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে, অথবা ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে আধুনিক শোধনবাদীরা সমাজতন্ত্রের যে অপরিমেয় ক্ষতি করেছে, সে বিষয়ে বিশ্বাস ছিল সমস্ত তর্কের ঊর্ধ্বে। অথচ দেখুন, এই দুই শিবিরের লোকেরাই দাবি করেন যে, তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করেন। তা হলে, আপনারা দেখছেন, উভয়পক্ষই নিজেদের সাম্যবাদী বলছেন, সাধারণভাবে উভয়েই সাম্যবাদী আন্দোলনের পরিমণ্ডলের মধ্যে আছেন, তবুও এত গুরুত্বপূর্ণ বা একটা মূল বিষয়ের উপর উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত একেবারে বিপরীত। এরকম কেন হচ্ছে?

আমাদের দেশেও দেখবেন, সিপিআই, সিপিআই(এম) বা অন্যান্য দলের এমন বহু নেতা কর্মী আছেন, যাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজনীতি যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনে ভাঙন ঘটাচ্ছে এবং কংগ্রেসের সুবিধা করে দিচ্ছে। আবার, উল্টোদিকে আমাদের দলে একেবারে সাধারণ স্তরে এমন বহু কর্মী আছেন, যাঁদের অন্য কোনও দলের নেতা কোনও মতেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সত্যিকারের বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কিত ধারণাকে গুলিয়ে দিতে পারবেন না।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, চিন্তাপ্রক্রিয়া এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতার সীমাটা এই জায়গায়। ব্যক্তির জিনিয়াস বা ট্যালেন্ট (প্রতিভা) যাই বলুন, কোনও কিছুই সীমাহীনভাবে স্বাধীন নয়, যেমন খুশি তিনি চলেনও না, চলতে পারেনও না। প্রত্যেকেই ভাবেন যে, তিনি খুব স্বাধীনভাবে মুক্তমনে চিন্তা করছেন। এ কথা ঠিক যে, মানুষের মনের একটা স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই স্বাধীনতা সীমাহীন নয়, তা আপেক্ষিক। মনের স্বাধীনতারও একটা সীমা আছে। সেই সীমাটা দুটো জায়গায়। একটা হচ্ছে বাস্তব পরিবেশ, আর একটা হচ্ছে চিন্তাপ্রক্রিয়া। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির ভিতরে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার অজান্তে বা জানিতভাবে তার চিন্তাপদ্ধতি গড়ে উঠেছে, সেই প্রক্রিয়াটির দ্বারা তার মনের বা চিন্তার স্বাধীনতা সীমায়িত। তাই আমরা একেক জন একেক রকমভাবে মার্কসবাদ বুঝছি, লেনিনবাদ বুঝছি এবং তা ব্যক্ত করছি। সমাজে অনেক ব্যক্তি যাঁরা মার্কসবাদকে সঠিক বলে মনে করেন, তাঁরাও মার্কসবাদকে বলছেন তাঁদের মতন করে। অনেকেই মনে করেন, মার্কসবাদের সমস্ত বই তিনি পড়েছেন, তিনি সব জানেন। মার্কসবাদ জানার তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। সুতরাং, তাঁর বোঝায়ও কোনও গণ্ডগোল হয়নি। এভাবে যাঁরা ভাবেন, দেখা যাবে, মার্কসবাদ নিয়ে তাঁদের মধ্যে পরস্পর আলোচনায় হয়তো কোনও পয়েন্টে কোথাও দু-লাইনের ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে ঐক্য হচ্ছে, কিন্তু, তারপর তিন লাইনে গিয়ে বলে দিচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য হবে না। অথচ সবাই মনে করছেন, তাঁরা সব জানেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে, কারওর মনে করাটা এখানে আসল নয়, তা দিয়ে সমস্যার মূল জায়গাটা ধরা যাবে না। এখানেই প্রশ্ন আসে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধির।

এখন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধি কথাটার মানে কী? এই 'প্রকৃত' বলতে আমরা কী বুঝি? যুক্তিসম্মত আলোচনায় পাওয়া যাবে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধি কথাটার

যথার্থ মানে হচ্ছে, সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বিচারপদ্ধতি, অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি। এই সঠিক বিচারপদ্ধতি বাদ দিয়ে কোনও একটা বিষয়ে আলোচনায় যদি মনে হয়, এটাই 'প্রকৃত' এবং তাকে কেন্দ্র করে ঐক্যও হয়, তবে তাতে লাভ হয় না। আজ যেটা মনে হল প্রকৃত, কালই আবার একটা ঘটনায় দেখা যাবে, সমস্তটাই গোলমাল হয়ে গেল। এতে যেটা হয়, তা হচ্ছে সাময়িক ঐক্য। এর নামই হল সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছানো। কিন্তু এ ঘটনা তো দুটো সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ চিন্তাপদ্ধতির লোকের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। তারাও তো অনেক সময় অনেক ইস্যুতে আপাতদৃষ্টিতে উপর উপর সাধারণ ঐক্যে আসে। একেবারে দুই বিপরীত মেরুর দর্শনের ব্যক্তিরাও একটা সাধারণ ইস্যুর উপর একটা মোটামুটি বিচারধারায় ঐক্যবদ্ধ হয়, একত্রে কাজ করে। না হলে, বিভিন্ন দল ও শক্তির যুক্তফ্রন্ট হয় কী করে? এইভাবে কোনও একটা সাধারণ ইস্যুর উপর ঐক্য করাটাই তো যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির মূল কথা। কিন্তু, এই মাপকাঠিতে তো একটা পার্টি প্রকৃতই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি কি না, তার বিচার হয় না। একটা পার্টি প্রকৃতই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি কি না, তার মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধিটা সঠিক কি না, তা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি, তা হলে সেই পার্টির বিচারপদ্ধতি কী, চিন্তাপ্রক্রিয়া কীরকম, অর্থাৎ সেটা সঠিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত বিচারপদ্ধতি এবং চিন্তাপ্রক্রিয়া কি না, সেইটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। অথচ এই ব্যাপারটা আমাদের দেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনে পরিষ্কার হয়নি। আমাদের দেশে প্রথমে সিপিআই, তারপর তা ভেঙে সিপিআই(এম), সেটাও ভেঙে পরে সিপিআই(এমএল) হল। অবশ্য, সিপিআই(এমএল) দ্রুত ভেঙে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সিপিআই এবং সিপিআই(এম) এই যে একই পার্টি ভেঙে দুটো পার্টি আমাদের দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নাম নিয়ে দাঁড়াল, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের স্বীকৃতি ও গৌরবকে ভিত্তি করে বড় পার্টি হয়ে গেল, তাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে উপলব্ধি কী? এই আসল জায়গাটাই কেউ বিচার করে পরিষ্কার করে নিতে চায় না। তাদের রাজনৈতিক প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তগুলো বিচার করতে গিয়েও আমরা প্রতিপদেই দেখছি যে, ছোটখাটো দু'চারটে বিষয় ছাড়া মূল বক্তব্য, রাজনৈতিক বক্তব্য তাদের আগাগোড়াই ভুল। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিপ্লবের স্তর, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি যে কোনও মূল বিষয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, এ সম্পর্কে সিপিআই, সিপিআই(এম)-এর বক্তব্য, বিশ্লেষণ, তত্ত্ব সবই ভুল।

কিন্তু আমি এর চেয়েও আর একটা মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে কেবল বিপ্লবের স্তর নির্ধারণটা সাধারণভাবে সঠিক হওয়াই বোঝায় না। যদিও বিপ্লবের স্তরটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে যে দলকে জনগণের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে হয়, জনগণকে সংগঠিত করতে হয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে টেনে আনতে হয়, তার কাছে রাষ্ট্রের চরিত্র কী, বিপ্লবের স্তর কী, কোন শ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে কোন কোন শ্রেণি মিলে উচ্ছেদ করবে— এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত জরুরি, এগুলো অন্যতম মূল বিষয়। এগুলো ছাড়া একটা রাজনৈতিক আন্দোলন দাঁড়াতেই পারে না। এগুলো হল একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের সামনে বিপ্লবী তত্ত্বের বিশেষীকৃত রূপ। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, এই জায়গায় যদি দুটো রাজনৈতিক দলের মিল হয়ে যায়, তাহলেই কি বলা যাবে, তত্ত্বের মিল হয়ে গেল? অনেকে বলবেন, মিল হল। আমি মনে করি, না। শুধু এই দিয়ে মিল হয় না। যেমন, আমরা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বলি, ভারতবর্ষ একটি পুঁজিবাদী দেশ এবং এখানে বিপ্লবটা হবে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই কথাটা আমাদের দেশে আরএসপি বলে, ওয়ার্কার্স পার্টি বলে, আরসিপিআই-ও বলে থাকে। এমন ব্যক্তিও দেশে পাওয়া যাবে, তত্ত্ব বোঝেন বলে যাঁদের অহমিকা আছে, তাঁদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরাও বলে দেবেন, ভারতবর্ষ একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, এখানে ক্ষমতায় আছে বুর্জোয়া শ্রেণি, তাদের উচ্ছেদ করবে শ্রমিক-চাষি-নিম্নমধ্যবিত্ত, নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা, বিপ্লবটা এখানে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ব্যস, তা হলেই কি এসব দল ও ব্যক্তির সাথে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মূল বক্তব্য মিলে গেল, তত্ত্ব মিলে গেল, এ কথা বলা যায়? না, বলা যায় না। এই মিল আছে কি না দেখতে গেলে দেখতে হবে, প্রত্যেকের বিচারপদ্ধতি, চিন্তাপ্রক্রিয়া, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মূল নীতিগুলোর সর্বব্যাপক ক্ষেত্রে উপলব্ধি, যৌথ চিন্তা বা যৌথ নেতৃত্ব এবং তার বিশেষীকৃত প্রকাশ— এইসব মূলগত বিষয়ে চিন্তাগত ভিত্তি এক কি না, অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে ধ্যানধারণাগুলো মূল যে চিন্তাগত ভিত্তি থেকে জন্ম নিচ্ছে, সেই ভিত্তিটা এক কি না।

এখন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই যে প্রকৃত উপলব্ধি, অর্থাৎ সঠিক মেথডলজি (বিচারপদ্ধতি), এটা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বই মুখস্থ করে আয়ত্ত করা যায় না। রাশিয়াতেও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মার্কস-এঙ্গেলসের কোটেশন আউড়ে রাশিয়ার সমাজ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাশিয়ার বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁরাও মুখে বলেছিলেন, মার্কসবাদ একটা ডগমা (সূত্রবাদ) নয়, কিন্তু বাস্তব বক্তব্যে ও কার্যকলাপে তাঁরা তাকে সূত্রবাদেই পরিণত করেছিলেন। মার্কস তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছিলেন, সর্বহারা বিপ্লব প্রথমে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই হবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তখনকার উদারনৈতিক পরিবেশ দেখে মার্কস এমন কথাও বলেছিলেন যে, ওইসব দেশে বিপ্লব শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে। রাশিয়াতে অনেক মার্কসবাদী পণ্ডিত মার্কসের ওই কথাগুলো আউড়ে বিপ্লব বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে লেনিনকে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামে নামতে হয়েছিল। লেনিন বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগের সঙ্গে মার্কসের যুগের পার্থক্য কী, এবং সেই পার্থক্য অনুযায়ী কেন এ যুগে বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর বদলে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের সবচেয়ে দুর্বল স্থানগুলিতে এসে যাবে এবং সেখানেই বিপ্লব হবে, তা দেখালেন। লেনিন তত্ত্বগত ভাবে এ-ও দেখালেন, আজকের যুগে বুর্জোয়ারা যখন গণতন্ত্রের চেয়ে সামরিকবাদ ও আমলাতন্ত্রের দিকেই বেশি ঝুঁকেছে, তখন প্রতিটি দেশে বিপ্লব সশস্ত্র হতে বাধ্য। এসব বিষয় ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও রূপ, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন, তার গণতন্ত্রের ধারণা, সর্বহারা একনায়কত্ব, সর্বহারা বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা চাষির ভূমিকা ইত্যাদি নানা মূল বিষয়ে প্লেখানভ, ট্রটস্কি, কাউটস্কি ও অন্যান্যদের সঙ্গে লেনিনের তীব্র বিতর্ক হয়। এই বিতর্ক কেন হল? সকলেরই তো মার্কস-এঙ্গেলস-এর বইগুলো কণ্ঠস্থ ছিল, তা হলে বিতর্ক হল কেন? কারণ, একদল কেবল মার্কস-এঙ্গেলসের বাণীগুলোকে, সিদ্ধান্তগুলোকেই তত্ত্ব বলে ধরে নিয়েছেন। আর, লেনিন মার্কসবাদের তত্ত্ব বলতে মার্কস-এঙ্গেলসের কথাগুলো, বা তাঁদের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্তগুলো তাঁরা করেছিলেন, শুধু সেগুলোকে মনে করেননি। তিনি ধরেছেন— যে বিজ্ঞানটাকে, যে বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করে মার্কস একটা সময়ে সিদ্ধান্তগুলো করেছিলেন, সেই বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটাই হল মার্কসবাদ। যেমন, মার্কস নিজে ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেখে সর্বহারা বিপ্লব গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ পথে হবে বলে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, প্যারি কমিউনের ঘটনার পর সেই অভিজ্ঞতার

ছয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েতী দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্যানিংয়ে বিক্ষোভ

ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লাগামহীন দুর্নীতি-দলবাজি, টাকা নয়ছয়, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহনির্মাণের তালিকার নির্দিষ্ট ক্রম না মেনে ব্যাপকহারে টাকা পয়সার বিনিময়ে নাম তালিকাভুক্ত করা এবং প্রকৃত প্রাপকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ২৩ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি) পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ দেখায়। শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটেশনে পঞ্চায়েত সংলগ্ন ক্যানিং হেড়োভাঙা মূল রাস্তা প্রায় দু'ঘণ্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশাল পুলিশবাহিনী ডাকে পঞ্চায়েত কর্তারা, যা দেখে সাধারণ মানুষের অনেকেই বলেন শাসক তৃণমূল নিজেদের অন্যায় কর্মকাণ্ডে নিজেরাই ভীতসন্ত্রস্ত। ডেপুটেশনের নেতৃবৃন্দের কাছে অবিলম্বে সমস্ত দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস স্মরণে

ওড়িশার রাউরকেল্লায় ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএসের উদ্যোগে ৯ অক্টোবর বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি উৎকলমণি পণ্ডিত গোপবন্ধু জয়ন্তী পালিত হয়

মুনবিম হাউজিং-এর নিরাপত্তা শ্রমিকদের দাবি আদায়

কলকাতার নিউটাউন থানার মুনবিম হাউজিং-এর ২২ জন সিকিউরিটি গার্ড সহ সকল শ্রমিকের বেতন বন্ধ ছিল গত পাঁচ মাস ধরে। কর্মচারীরা একাধিকবার হাউজিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের কাছে বেতন দেবার দাবি জানালেও কর্তৃপক্ষ বেতন দেয়নি। বেতন না দেবার কোনও কারণও জানায়নি। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (কন্ট্রাক্টার্স) ওয়াকার্স ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ করেন। গড়ে ওঠে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (কন্ট্রাক্টার্স) ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন মুনবিম ইউনিট। ১০ অক্টোবর থেকে কমিটির ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে ৩০ অক্টোবর কর্তৃপক্ষ বেতন মিটিয়ে দিতে বাধ্য হন। নেতৃত্ব দেন ইউনিট সভাপতি কমরেড জগন্ময় কর্মকার, সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ প্রমুখ।

আইনজীবীর খুনিদের শাস্তির দাবি লিগাল সার্ভিস সেন্টারের

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার আঝাপুর গ্রামের বাসিন্দা আইনজীবী মিতালী ঘোষকে (৫৮) ২৬ অক্টোবর একদল দুষ্কৃতী নৃশংসভাবে খুন করে। এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরদিনই লিগাল সার্ভিস সেন্টারের পূর্ব বর্ধমান জেলার সদস্য মিঠু আহমেদ ও অসিত ঘোষের নেতৃত্বে মিতালী দেবীর এক ভাই ও গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ব্যাপক প্রতিবাদের আহ্বান জানান।

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্ট ও কলকাতা, হাওড়া, আলিপুর, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ কোর্ট সহ রাজ্যের সমস্ত কোর্টে ৩১ অক্টোবর রাজ্য বার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা পেন ডাউন, কর্মবিরতি সফল করার জন্য পোস্টারিং, সভা সংগঠিত করে। কর্মসূচি রাজ্য জুড়ে সফল হয়।

বর্ধমানে আইনজীবীরা বিশাল মিছিল করে ডিএম, এসপি-র কাছে খুনিদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান। সিপিডিআরএস পূর্ব বর্ধমানের ডিএম, এসপি ও জামালপুর থানায় ডেপুটেশন দেয়।

বীরভূমে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্মেলন

উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২০ অক্টোবর চতুর্থ বীরভূম জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রামপুরহাট শহরে। ওই দিন বিদ্যাসাগর ফ্রি কোচিং সেন্টার হলে শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক জমায়েত হন। অসিত মজুমদারের সভাপতিত্বে সম্মেলনে উপস্থিত গ্রাহকেরা একদিকে ব্যাপক মাশুল বৃদ্ধির চাপ, অন্য দিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং এর প্রতিরোধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। প্রধান আলোচক ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য সহ সভাপতি অশোকতরু প্রধান। রাজ্য সম্পাদক সকল স্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকা ভিত্তিক কমিটি গঠন করে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অসিত মজুমদারকে সভাপতি, বিভাস ভট্টাচার্যকে সম্পাদক ও স্বপন রুজকে অফিস সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ করে ৩০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মৃত ফালু দাসকে ভারতীয় ঘোষণার দাবিতে নলবাড়িতে ধরনা

আসামে গোয়ালপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্পে চূড়ান্ত অমানবিক পরিবেশে সীমাহীন কষ্ট ভোগ করে সম্প্রতি মারা গেছেন নলবাড়ি জেলার বরক্ষেত্রী এলাকার মৎস্যজীবী ফালু দাস। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তাঁকে 'ডি-ভোটার' এবং 'বিদেশি' ঘোষণা করে আসাম সরকার এই নির্যাতন ক্যাম্পে ঢোকায়। এরকম অসংখ্য প্রকৃত ভারতীয়কে বিদেশি তকমা দিয়ে জেলে ঢোকাচ্ছে আসামের সাম্প্রদায়িক বিজেপি এবং উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী এজিপি সরকার।

ডিটেনশন ক্যাম্পে মৃত ফালু দাসকে অবিলম্বে ভারতীয় ঘোষণার দাবিতে ৩১ অক্টোবর নলবাড়ি জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হয় 'অনুসূচিত জাতি ছাত্রসংস্থা' সহ বিভিন্ন সংগঠন। সেখানে এস ইউ সি আই (সি) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। দাবি ওঠে, মৃতের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে, বন্ধ করতে হবে ডিটেনশন ক্যাম্প। দলের পক্ষ থেকে ডি এমের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকপত্র পাঠানো হয়। সেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়, দুলাল পাল, ফালু দাস ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বিদেশি তকমা ও ক্যাম্পের নরকযন্ত্রণায় মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী রাজ্য সরকার। স্মারকপত্রে দাবি জানানো হয়, একজনও ভারতীয় নাগরিককে যেন বিদেশি তকমা দিয়ে অভিযুক্ত না করা হয়। আরও দাবি জানানো হয়, কেউ মিথ্যা মামলায় ফরেনার্স ট্রাইবুনালে অভিযুক্ত হলে সরকারি উদ্যোগে নিরখরচায় উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

কলকাতা জেলা ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বাতিলের দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৭০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কমরেড সুমন দাস সভাপতি এবং কমরেড আবু সাঈদ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

কোচবিহারে কৃষক আন্দোলন

কৃষি ঋণ মকুব, কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম, সরকারি বিপণন কেন্দ্র খোলা, এনআরসি রোধ, এনআরসি-র আতঙ্কে মৃত মোক্তার মিঞা সহ অন্যদের এবং কৃষিঋণ পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যাকারীদের পরিবারের আত্মীয়দের চাকরি ও এককালীন ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া প্রভৃতি ন' দফা দাবিতে ৩১ অক্টোবর জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যপালের উদ্দেশে স্মারকলিপি জমা দেয় 'কোচবিহার জেলা আলু-পাট-ধান চাষি সংগ্রাম কমিটি'। স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ডিএম-এর প্রতিনিধি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কুপেন বর্মন বলেন, বাংলায় এনআরসি চালুর হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর অন্তঃসারশূন্য অভয়বাণী কোনও মানুষের কাজে লাগছে না। ১৯৭৪ সালে জেলার মহাফেজখানা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়ায় কোচবিহার জেলার জনসাধারণ দিশাহারা হয়ে রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় বহু টাকা খরচ করে রেকর্ড সংগ্রহ করতে গিয়ে দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ছেন। এ সমস্যা নিরসনে মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে।

তিন শতাধিক সংগ্রামী কৃষকের মিছিল শহর পরিক্রমা করে ডিএম অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। বিশিষ্ট কৃষক নেতা নৃপেন কার্যি বলেন, এনআরসি রুখতে সমস্ত স্তরের নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলন পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বীরেন মণ্ডল, কৃষ্ণ বর্মন, আব্দুল করিম মিঞা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ডোমজুড়ে ধর্ষণ ও হত্যা, এমএসএসের বিক্ষোভ

হাওড়ার ডোমজুড়ের কাটলিয়া গ্রামের মালিক পাড়ার হতদরিদ্র যুবতী ৩০ অক্টোবর প্রতিদিনের মতো লোহার ছাঁট সংগ্রহ করতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। বহু খোঁজাখুঁজির পরে রাত ১১টা নাগাদ ওই যুবতী লক্ষ্মী ধাড়ার মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরদিন খবর পাওয়ার সাথে সাথে এমএসএসের জেলা সম্পাদিকা পুতুল চৌধুরী, মিতা হোড়, বেবি দাস ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতার পরিবার ও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় মানুষ প্রতিনিধিদলকে বলেন, থানা কর্তৃপক্ষ এফআইআর তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাঁদের প্রশ্ন, গরিব বলে কি তাঁরা কোনও বিচার পাবেন না? দোষীরা ধরা পড়বে না? এর পর প্রতিনিধিরা ওই দিন থানায় গিয়ে ডেপুটেশন দেন।

শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নের দাবিতে

এস ইউ সি আই (সি)-র ধরনা

১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত শিলচর মেডিকেল কলেজে আজও চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠল না। চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির দাবিতে ২৫ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি) কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে হাসপাতালের মূল গেটের সামনে ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগে 'কার্ডিওলজিস্ট' ও 'কার্ডিও ভাসকুলার সার্জন' না থাকার ফলে বহু রোগীকে বাধ্য হয়ে ৩০০-৪০০ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা পাড়ি দিয়ে শিলংয়ের 'নিগগ্রিমস' বা গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে অনেকেই বিনা চিকিৎসায় মাঝপথেই মারা যান। একদিকে পরিকাঠামোর সমস্যা, অন্যদিকে ব্লাড ব্যাঙ্ক ও রোগীদের খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি আজ জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। সমস্যা সমাধানের দাবিতে ধরনা শেষে এস ইউ সি আই (সি) দলের একটি প্রতিনিধি দল কলেজের অধ্যক্ষের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে দাবিপত্র দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড ভবতোষ চক্রবর্তী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস সুব্রত চন্দ্র নাথ, শ্যামদেও কুর্মী, মাধব ঘোষ প্রমুখ।

ছত্তিশগড়ে বিদ্যাসাগর স্মরণে আলোচনাসভা

ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে ১৯ অক্টোবর ডিপি বিপ্রা কলেজে একটি সেমিনার হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিজ্ঞান আন্দোলনের সর্বভারতীয় সংগঠক দেবাশিস রায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে বিজ্ঞান আন্দোলনের সংগঠক পূজা শর্মা। এ ছাড়াও কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান ডঃ রেণু নায়ার সহ অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিলেন কলেজ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সহ বহু শিক্ষণীয় দিক আলোচনায় উঠে আসে।

গোয়ালপাড়া কলেজে ৫ আসনে ডিএসও-র জয়

আসামের ওয়েস্ট গোয়ালপাড়া কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ডিএসও পাঁচটি আসনে জয়লাভ করেছে। ফি বৃদ্ধি, ব্যবসায়ীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য এবং কলেজের ভিতরে ও বাইরে সংগঠনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলে। এরই ফলে 'এন এস ইউ আই' ও 'ছাত্র মুক্তি'র মতো সংগঠনগুলির লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ছাত্রদের প্রলোভিত করার রাজনীতিকে পরাস্ত করে এআইডিএসও-র পাঁচ জন প্রার্থীকে ছাত্ররা জয়ী করে। উপসভাপতি পদে আশা পারভিন, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে ওয়াসিম আক্রম, ক্রীড়া সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম, আলোচনা সম্পাদক পদে আরিফা আহমেদ এবং তর্ক ও আলোচনা সম্পাদক পদে রশিদুল ইসলাম বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

কামাখ্যা রাম বরুয়া কলেজেও জয় ঃ অন্যদিকে গুয়াহাটির কামাখ্যা রাম বরুয়া গার্লস কলেজের নির্বাচনে সহ সম্পাদিকা পদে ডিএসও-র সিমি গগৈ বিজয়ী হন।

বাঙ্গালোরে এসইউসিআই(সি)-র বুকস্টলে ছাত্র-যুবরা

গণবিক্ষোভে ফুঁসছে ইরাক

ইরাকের রাজপথ উত্তাল সরকার বিরোধী বিক্ষোভে। আন্দোলনের চাপে প্রধানমন্ত্রী আদেল আবদুল মাহদি জানিয়েছেন, যদি রাজনৈতিক দলগুলি রাজি থাকে, পদত্যাগে তাঁর আপত্তি নেই। নির্বাচন এগিয়ে আনতে ইরাকের প্রেসিডেন্ট বারহাম সালেহ নতুন আইনের খসড়া তৈরি করা শুরু করেছেন।

অক্টোবর মাস জুড়ে ইরাক দু-দফায় উত্তাল হয়ে ওঠে বিক্ষোভে। ব্যাপক গরিবি, বেকারি, প্রশাসনিক অপদার্থতা ও সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ১ অক্টোবর পথে নামেন ইরাকের হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের দাবি ইরাকের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও ওঠে। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ। ছিলেন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও।

এক বছর আগে উন্নয়নের ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেছিলেন আবদুল মাহদি, যার এক শতাংশও পূরণ করেননি তিনি। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে ইরাকের মানুষ। ১ অক্টোবর রাজধানী বাগদাদে শুরু হয়ে দ্রুত দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। প্রথম দফায় ছ'দিন ধরে লাগাতার চলতে থাকে প্রতিবাদী মিছিল, রাজপথ অবরোধের ঘটনা। আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম আক্রমণ চালায় পুলিশ। মাথা, বুক লক্ষ্য করে গুলি, বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে কড়া ধরনের কাঁদানে গ্যাসের শেল খুব কাছ থেকে ছোঁড়া যাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে— এসব কোনও কিছুই বাদ দেয়নি পুলিশ। সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ১৪৯ জনের। বিক্ষোভের চাপে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভার রদবদল, উঁচু পদের সরকারি কর্মীদের বেতন ছাঁটাই এবং বেকারি দূর করার জন্য নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও প্রতিশ্রুতি পালনে সরকারের উদ্যোগ চোখে না পড়ায় ২৫ অক্টোবর থেকে ইরাকের মানুষ আবার রাস্তায় নামেন। ২৮ অক্টোবর মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ, বিশেষত ছাত্র-যুবরা রাজধানী বাগদাদ সহ অন্যান্য শহরে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন। রাজধানী শহরের তাহরির স্কোয়ারে ধরনা এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল 'গ্রিন জোন'-এ পৌঁছবার সেতু অবরোধ করে রাখেন বিক্ষোভকারীরা। অবরোধ হঠাতে পুলিশ আবার ব্যাপক হামলা চালায়।

প্রাকৃতিক সম্পদে, ঐতিহ্যে, প্রগতিশীলতায় আরব দুনিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ ইরাকের দুঃসময়ের শুরু ২০০৩ সালে। দেশের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত রেখেছেন, এই অজুহাতে ওই বছর ইরাকে নির্মম আগ্রাসন শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। লক্ষ্য ছিল ইরাকের বিপুল তেলসম্পদের দখল নেওয়া। এই হানাদারিতে নিহত হন ইরাকের হাজার হাজার মানুষ। আহত অসংখ্য। গোটা দেশটাকে গুঁড়িয়ে দেয় সাম্রাজ্যবাদী সেনারা। সন্ত্রাসবাদী আইসিস বাহিনীকে দমনের নামে বছরের পর বছর ধরে ইরাকে সেনা মোতায়েন রাখে আমেরিকা। ২০০৫-এ ইরাকে কায়েম হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকারের শাসন। সেই থেকে একের পর এক নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত, জনদরদী সরকারের দেখা মেলেনি। দুনিয়ার আর পাঁচটা পুঁজিবাদী দেশের মতো ইরাকেও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে গরিবি, বেকারি, দুর্নীতির মতো সমস্যা। বিপুল তেল সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে সরকারি হিসাবেই ইরাকের ২৩ শতাংশেরও বেশি মানুষ বাস করেন দারিদ্রসীমার নিচে। সরকারি হিসাবেই তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৫ শতাংশ। বাস্তবটা এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। অসহনীয় এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ইরাকের মানুষ পুলিশের নির্মম আক্রমণ উপেক্ষা করে দিনের পর দিন বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রাণ দিচ্ছেন। আবার রক্তে ভিজছে ইরাকের পথঘাট।

বিক্ষোভকারীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইরাকী সংসদের চারজন সদস্য পদত্যাগ করেছেন। আন্দোলনের চাপে প্রধানমন্ত্রী মাহদি কর্মহীন দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য পেনশন, গরিব মানুষের থাকার জন্য জমি এবং যুবকদের সহজে ঋণ দেওয়ার মতো কিছু প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। এমনকি সম্প্রতি পদত্যাগেও রাজি হয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করা অবশ্যই গণআন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায়। কিন্তু এক প্রধানমন্ত্রীর বদলে অন্য প্রধানমন্ত্রী এলেও মানুষের মূল সমস্যাগুলির সমাধান যে হবে না, এই আন্দোলনে সেই সচেতনতা আসা আজ খুবই জরুরি। সমৃদ্ধ ইরাককে যে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি ধ্বংস করেছে, ইরাকের মানুষের আন্দোলন একদিকে তার বিরুদ্ধে যেমন পরিচালিত হওয়া দরকার, একই সাথে দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের পথেই এই আন্দোলন চালিত করা দরকার। এই পথেই ইরাকের জনগণ পাবেন তাঁদের আকাঙ্খিত মুক্তি।

পাঠকের মতামত

অর্থনীতির গভীরতর অসুখ এখন

'যা কহিলে সত্য হল গান্ধারী জননী...' এই আক্ষেপ উক্তিটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পরাজিত, হতাশ, অবসন্ন, ভগ্নদেহ স্বয়ং দুর্যোধনের। গান্ধারী তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির এবং অসামান্য মেধার দ্বারা আগাম আঁচ করতে পেরেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কী পরিণতি হতে পারে। বারংবার তিনি দুর্যোধনকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন, ঠিক একই রকম ভাবে বছর কয়েক আগেই দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদরা ভারতের অর্থনীতির আকাশের ঈশান কোণে এক চিলতে কালো মেঘ দেখতে পেয়েছিলেন। বারবার সতর্ক বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। সেই মন্দার কালো মেঘ শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীর অর্থনীতির আকাশ ছেয়ে প্রলয় ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তথা আইএমএফ-এর কর্ণধার ক্রিস্টালিনা জর্জিভা স্বীকার করে নিয়েছেন ২০১৯ সালে আর্থিক বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার (ইকনমিক্যাল গ্রোথ স্লো ডাউন হওয়ার) সম্ভাবনায় বিশ্বের ৯০ শতাংশ এলাকাতেই, প্রায় থমকে গিয়েছে বাণিজ্য। আমেরিকা, জাপান, ইউরোপ, চীন— আর্থিক কর্মকাণ্ড কমেছে প্রায় সর্বত্র, ভারত, ব্রাজিলের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর প্রভাব সব থেকে স্পষ্ট। চীনেও শ্লথ হচ্ছে বৃদ্ধি।

শুধু গাড়ি শিল্পেই ভারতে কাজ খুইয়েছেন কয়েক লক্ষ কর্মী। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন যে, গাড়ি থেকে বিস্কুট সমস্ত পণ্যের বিকিকিনি প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই অর্থনৈতিক মন্দা মোটামুটি স্থায়ীভাবে জারি রয়েছে। এ জন্য পণ্য উৎপাদন ব্যাপক হারে সংকুচিত হচ্ছে। কল-কারখানায় লক-আউট, ক্লোজার নিয়মিত হয়ে পড়েছে। কোটি কোটি কর্মচ্যুত শ্রমিক মরিয়া হয়ে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটি এখন দৈনন্দিন সাধারণ চিত্রপ্রবাহ।

মাননীয়া অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনজি মোটর-ভেহিকেল ইন্ডাস্ট্রির মন্দাতে সরাসরি দায়ী করেছেন ভারতের ইয়ং জেনারেশন বা জেন ওয়াই-কে। তারপরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোথাও এই সংকটের কার্ল মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ অন্তত আমার চোখে পড়েনি। আমি অর্থনীতির লোক নই, পাশাপাশি মার্কসীয় তাত্ত্বিকও নই। একেবারে সাধারণ মানুষ। সাধারণ চোখে যা দেখেছি তাই লিপিবদ্ধ করছি।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬-'১৭ সালে ট্যাক্সি পরিষেবার জন্য দেড়লক্ষ গাড়ি বিক্রি হয়েছিল। ২০১৭-'১৮ সালে সংখ্যাটা ৭৫ হাজারে নেমে আসে। অর্থাৎ এক বছরে এক ধাক্কায় উৎপাদন সংকুচিত হয়ে অর্ধেকে নেমে এসেছে। আঘাতটি বিশাল। পাশাপাশি, মনের মধ্যে আরও বেশ কিছু প্রশ্নমালা উঁকি মারে যেমন— ক) এই গাড়ি শিল্পের নানারকম যন্ত্রাংশ সরবরাহকারি সংস্থা যাকে সাধারণত অনুসারি শিল্প বলা হয়, সেখানেও নিশ্চয়ই ওই হ্রস্বমুখী উৎপাদন হারকে মাথায় রেখে নিজেদের উৎপাদনকেও অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। সেই সংস্থাগুলিতেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কর্মদিবস ও কর্মীসংকোচন হয়েছে—তা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গিয়েছে। শুধু পরিবহণ নয়, সব ধরনের উৎপাদন শিল্পেই কালো মেঘ ঘনিয়েছে।

খ) যারা এই সব অনুসারি শিল্পে বিভিন্ন কাঁচামাল অর্থাৎ লোহা, আকরিক, ইস্পাত, কাস্ট আয়রন, নাইলন, রাবার টায়ার, ফোম, ফাইবার গ্লাস, কাঁচা সামগ্রী ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকেন তাদের খবর কে রাখে? সেখানেও সমানুপাতিক হারেই সরবরাহ সংকোচনের রেখাচিত্রটি নিম্নগামী হয়েছে। এই স্বাভাবিক সত্যটি বোঝবার জন্য আমাদের অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। চোখ-কান খোলা থাকলেই যথেষ্ট।

গ) আরও একটু পিছনে তাকালেই দেখা যাবে যে এইসব প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহকারী সংস্থার পিছনে রাসায়নিক সরবরাহকারি সংস্থার কত কর্মী কর্মচ্যুত হয়েছেন সে ব্যাপারে আমরা গাঢ় অন্ধকারে। যে কোনও শিল্পের মন্দাই একটা চেইন রিঅ্যাকশন রিফ্লেক্ট করে। এটা একটা প্যারাডাইম মাত্র। এই কর্মচ্যুত শ্রম-শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরে যে পরিমাণ শ্রমিক কর্মহীন হয়েছেন তার সঙ্গে পরিবারের ন্যূনাধিক পাঁচজন নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেব করলে আর্থিক ক্ষতির অভিঘাত-জর্জরিত মানুষের সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা পুঁজিপতিরা হিসেব কষে দেখছেন তো?

অর্থনীতির গভীরতর অসুখ এখন। প্রায় দুই শতক ধরে বুর্জোয়া শিল্পপতিরা, পুঁজিপতিরা যে লাগাতার নির্মম শোষণ এই বিশ্বের নাগরিক সমাজে চালিয়ে গেছেন তারই কদাকার রূপ হল সামগ্রিক শিল্পের ধ্বংসায়ন। পরিবহণ শিল্প তার একটা ছোট নমুনামাত্র। স্বর্ণ, বস্ত্রবয়ন, আবাসন, সমস্ত সেক্টরেরই এক হাল। একটু কান পাতলেই সর্বত্র তার হাহাকার শুনতে পাওয়া যবে। পুঁজি সেন্ট্রালাইজড হতে হতে এমন চূড়ান্ত অবস্থানে পৌঁছে গেছে যে এখন আমজনতার হাতে কোনও উদ্বৃত্ত অর্থই নেই। যার ফলে জনতার কমছে সঞ্চয় এবং রাশ পড়ছে কেনাকাটায়। একটা মৌচাককে যদি গামছার মধ্যে ফেলে কষে নিংড়ানো যায় তার পরে কি আর তার কাছে এক বিন্দুও মধুর প্রত্যাশা করা যায়। ঠিক একরকমভাবে আমাদের সমাজ ট্রিকলড ডাউন ইকনমি বা চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতির হাতে পড়ে আক্ষরিক অর্থেই নিঃশেষিত। সামগ্রিক খোলনলচে বদলানো ছাড়া এর থেকে পরিত্রাণ নেই। অর্থনৈতিক সংস্কার নয়, চাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের বিপ্লব।

মাননীয়া সীতারামনজি এটা হয়তো বুঝতে পারছেন না যে, ক্রমাগত পুঁজি কেন্দ্রীভূত হতে হতে এখন গতিহীনভাবে থমকে আছে। ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি তাঁর গবেষণাপত্র (ক্যাপিটাল ইন দ্য ফার্স্ট সেঞ্চুরি গ্রন্থের লেখক) সরাসরি দেখিয়েছেন ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য এখন গত ৯৬ বছরের মধ্যে সবথেকে বেশি। 'ধনের ধর্মই অসাম্য' শীর্ষক লোকহিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যবান মন্তব্য আমরা যেন ভুলে না যাই। অক্সফ্যামের সাম্প্রতিক রিপোর্ট তো বলছেই ভারতবর্ষের সব থেকে ধনী ১ শতাংশ পরিবারের হাতে কুক্ষিগত দেশের মোট সম্পদের অর্ধেকেরও বেশি। অর্থাৎ শোষণ এভারেস্টের চূড়া জয় করে ফেলেছে আর শোষণ করা যাচ্ছে না। এবার রেখাচিত্রকে নিচে নামতেই হবে।

আমরা সাধারণ মানুষ বেশ বুঝতে পারছি যে, পুঁজিবাদী ডাক্তাররা রোগীর রোগ ধরতে পারছেন না। ফলে এলোপাথাড়ি নানা ওষুধের প্রেশক্রিপশন করে যাচ্ছেন। এই ভেবে যদি কোনওটা কাজে লেগে যায়। কখনও রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৫.১৫ শতাংশ তো, কখনও রিভার্স রেপো একই হারে ৪.৯০ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০১৯ সালে পাঁচবার ঋণ নীতিতে সুদ কমালো, ভবিষ্যতে আরও কমানোর রাস্তা খুলে রাখল। কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হচ্ছে। যার পরিণাম সমস্ত উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পে ভাটার টান, পরিষেবা ভিত্তিক কর্মক্ষেত্রগুলি টিমটিমিয়ে বেঁচেবর্তে আছে। এরই প্রতিফলন ধরা পড়েছে মার্কিন কম্পিউটার ও প্রিন্টার প্রস্তুতকারক সংস্থায়। এইচ পি আগামী কয়েক বছরে বিশ্বজুড়ে তাদের মোট শ্রম সম্পদের ১০ শতাংশের বেশি কমাবে। তিন বছর আগে একই পদক্ষেপ করেছিল এইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ভাবেই। অশোক লে ল্যান্ড ২০১৯-এর অক্টোবর মাসে তাদের বিভিন্ন কারখানায় ১৫ দিন পর্যন্ত উৎপাদন বন্ধ রাখবে। কারণ দেশজুড়ে সব ধরনের গাড়ির চাহিদা কম। বিক্রিতে ভাটা তাদেরও।

২০১৭ সালে ক্রেডিট সুইস সংস্থা প্রকাশিত 'গ্লোবাল ওয়েলথ রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ভারতের সব থেকে সম্পদশালী পরিবারটিকে প্রথম স্থানে রেখে অন্যপরিবারগুলিকে তাদের সম্পদের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সাজালে দেখা যাবে যে, ২০০২ থেকে ২০১২-এর মধ্যে এই ক্রমবিন্যাসের প্রথম ১ শতাংশ পরিবারের সম্পদ ভারতের মোট সম্পদের ১৫.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫.৭ শতাংশে। শেষ ৫০ শতাংশ পরিবারের সম্পদ ৮.১ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪.২ শতাংশ। ২০১৮-'১৯-এ সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যের চেহারা আরও ভয়াবহ। খেটে খাওয়া মেহনতি ভারতীয়ের হাতে ফুটো পয়সাটিও নেই।

তামাম দরিদ্র বিশ্ববাসীর সমীপে আমার বিনম্র আবেদন, বিশ্বজুড়ে এই অর্থনৈতিক বেহাল পরিস্থিতি দেখে আপনারা মোটেও মুষড়ে পড়বেন না, বরং উল্লসিত হোন। কারণ শম্বুক গতিতে হলেও এই পুঁজি নিবিড় বুর্জোয়া অর্থনীতির ক্রমান্বয়ে মাল্টি-অর্গান ফেল করছে। কোনও ভেন্টিলেশনে একে বাঁচানো যাবে না। বুর্জোয়া অর্থনীতির চিতাভস্ম থেকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ফিনিক্স পাখি তার আগুনে-সোনালী ডানা আকাশে মেলে উড়বে। শুধু ধৈর্যে বুক বেঁধে তৈরি হোন। সে আসছে ... সে আসছে... সে আসছে। সে খুব বেশি দূরে নেই। তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

বিশ্বদীপ ভট্টাচার্য
কল্যাণগড়, উত্তর ২৪ পরগণা

বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি বুঝেছিলেন

তিনের পাতার পর

ভিত্তিতে মার্কস তাঁর একই বক্তব্যের উপর নিজেই 'গোথা প্রোগ্রামে' সংশোধনী এনেছিলেন। দু'য়ের মধ্যে সময়েরও খুব পার্থক্য ছিল না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আগ্রাসী রূপটা না দেখে মার্কস একরকম সিদ্ধান্ত করেছিলেন, পরে প্যারি কমিউন তাঁকে শুধরে দিয়েছে। আজও যাঁরা মার্কসের কোনও কথা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এই কথাটা মার্কস বলেছিলেন, যা ইতিহাসে ফলেনি, ওই কথাটা ফলেছে, তাঁরা কি মার্কসবাদী? তাঁরা মার্কসবাদ বোঝেনইনি। লেনিন ঠিকই ধরেছিলেন যে, এগুলো মার্কসবাদ নয়, এভাবে মার্কসবাদ বোঝা যাবে না, তাকে প্রয়োগ করা যাবে না।

একইভাবে লেনিন কোথায় কী বলেছেন, তা লেনিনবাদ নয়। লেনিন যে বিজ্ঞানটিকে প্রয়োগ করলেন, যে কায়দায় যেভাবে করলেন এবং তা করতে গিয়ে আবার ওই বিজ্ঞানকে, ওই বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে তিনি যতটা উন্নত করলেন এবং তার ভিত্তিতে একটা বিশেষ অবস্থায় যে মূল নীতিগুলো নির্ধারণ করলেন, সেই মূল নীতিগুলো হল মূল বুনিয়াদ, আর সেই বিচারবিশ্লেষণ পদ্ধতিটি হল লেনিনবাদ। সেটি আয়ত্ত করতে না পারলে, শুধু লেনিনের কথাগুলো মুখস্থ করে আওড়ালে কিছুই হবে না, শুধু নকলনবিশি করা হবে। তাই লেনিনের সময় পার্টি গঠন, আর আজকের সময়ে ভারতবর্ষের জমিতে পার্টি গঠনের পদ্ধতি হুবহু এক হতে পারে না— বিশেষ করে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আজ যে রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে, তা লেনিনের সময় এই রূপ নিয়ে ছিল না। আজকের সমাজে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটানোটা প্রধান সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়ে নেই। পুরোপুরি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার বিপ্লবের স্তরে, ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে ব্যক্তিসত্তাকে উদ্দীপ্ত করাটাই প্রয়োজন হিসাবে থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়া শাসন যেখানে কয়েক যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে বুর্জোয়ারা পিছিয়ে-পড়া বা অগ্রসর যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই হোক এক ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান চালু করার চেষ্টা করেছে, সেই সমাজটা যেহেতু আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়ে গেছে, সেহেতু সেটা যদি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে-পড়াও হয়, তবুও সেই পিছিয়ে-পড়া বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজের মতন একই লক্ষণগুলো জন্ম নেবে। এইসব পিছিয়ে-পড়া বুর্জোয়া সমাজেও ব্যক্তিবাদ আজ অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজগুলোর মতো একটা সুবিধায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ আজ ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাধীনতার কথাটা যেমন করে ভাবে, বিচার করে, অধিকারটা দাবি করে, সেই অধিকারটা আজ আর লড়াই করে আদায় করার জায়গায় নেই।

বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করার বিষয়টা ছিল— স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, সামন্তী বাঁধনের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় কুসংস্কার-কুআচারের বিরুদ্ধে, পরদেশ দখলদারীর বিরুদ্ধে লড়ে কিছু অর্জন করার বিষয়। সেদিন এই ব্যক্তির অধিকারের লড়াইটা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতিনৈতিকতার ধারণার উপর সমাজপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের পরিপূরকই ছিল। তাই সামাজিক আন্দোলনে ব্যক্তিবাদ সেদিন তেমন কোনও ঝামেলার সৃষ্টি করেনি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, দেশাত্মবোধক আন্দোলনে, বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যক্তিসত্তাগুলো সামনে এসে প্রবল ঝঞ্ঝাট তৈরি করেনি। কিছু কিছু হয়তো করেছে, তবুও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার প্রশ্নে তা সামগ্রিকভাবে বাধা ছিল না, ব্যক্তি-ব্যক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যেই ঐ ব্যক্তিবাদ মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, একটা প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যেখানে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেমন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের মতো দেশ— এইসব দেশে ব্যক্তিবাদ যে রূপ নিয়েছে, এমনকী ভারতবর্ষেও তার খানিকটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আজকে এইসব দেশে একটা বিপ্লবের স্লোগান নয়, সেইমতো কোনও দায়দায়িত্ব তার নেই। তা অধিকার অর্জনের হাতিয়ারের বদলে একটা প্রিভিলেজ-এ (সুবিধায়) অধঃপতিত হয়েছে, যাকে বলা হয় নিকৃষ্ট ধরনের ব্যক্তিবাদ। সমাজ পরিবেশে এই নোংরা ব্যক্তিবাদের প্রভাব সমাজ অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কাজ করছে। এমন একটা পরিবেশ থেকে একটা দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বা তার কর্মকাণ্ড বা আন্দোলনও বিচ্ছিন্ন নয়।

(১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বর প্রদত্ত ভাষণ)
'বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্কসবাদী বিজ্ঞান'
নির্বাচিত রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১৫)

আত্মমর্যাদাবোধ ও বিদ্যাসাগর

নজরুলের কবিতায় আছে, "বল বীর, বল উন্নত মম শির"। এই কবিতার বিখ্যাত পঙক্তিগুলি প্রায় সকলেরই জানা। অনেকটা প্রবাদের মতো হয়ে গেছে, 'ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর।' সামন্তী চিন্তার নিগড় ভেঙে মাথা তুলে দাঁড়ানো এই মানুষ নিছক ব্যক্তি নয়, মনুষ্যত্বের গুণাবলিতে সমৃদ্ধ ব্যক্তি।

ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ আন্দোলনের তাৎপর্য উল্লেখ করতে গিয়ে 'ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার' গ্রন্থের ভূমিকায় এঙ্গেলস অনবদ্য ভাষায় বলেছেন, "It was the greatest progressive revolution that mankind has so far experienced, a time which called for giants and produced giants– giants in power of thought, passion and character in universality and learning." অর্থাৎ, নবজাগরণ আন্দোলন চিন্তা-চরিত্র-আবেগ ও জ্ঞানচর্চায় অসংখ্য অনন্যপ্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে। আমাদের দেশের নবজাগরণ আন্দোলনও সমস্ত দিক থেকে তেমনই বিরাট মাপের মানুষ হিসাবে বিদ্যাসাগরের জন্ম দিয়েছে।

ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কী বোঝায়? এর অর্থ হল, জীবনে কোনও পরিস্থিতিতেই অন্যায় বা অসত্য আচরণ না করা এবং অন্য যে-কেউ এধরনের আচরণ করলে তার প্রতিবাদ করা। অন্যায় বা অসত্য আচরণ মানুষ করে নানা প্রলোভনে কিংবা ক্ষতি বা লোকসানের ভয় থেকে। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের এই ভয় থাকে না। তাই তাঁরা হন সবসময়ই নির্ভীক। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই ধরনের এক নির্ভীক মানুষ। সে কারণেই তিনি উদ্ধত সাহেবের সামনে চটিপরা পা টেবিলে তুলতে পেরেছিলেন এবং তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন।

আজ যখন পরিস্থিতির চাপের অজুহাতে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করাটাকেই বাস্তববাদিতা বলে চালানো হচ্ছে, ব্যক্তিগত লাভ কিংবা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ক্ষমতাবানদের কাছে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেওয়াটা যেন স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় বিদ্যাসাগরের চরিত্র আমাদের সামনে এক সুমহান এবং অমূল্য শিক্ষামালার মতো উপস্থিত হয়েছে।

বর্ধমানের মহারাজা বিদ্যাসাগরের দানশীলতা এবং অন্যান্য সমাজগঠনমূলক কাজকর্মের কথা শুনে খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। একবার তাঁকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। চলে যাওয়ার সময় রাজবাড়ির রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণবিদায় হিসাবে তিনি বিদ্যাসাগরকে নগদ ৫০০ টাকা এবং একজোড়া দামী শাল উপহার দিতে গেলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুই নিতে রাজি হলেন না। মহারাজাকে তিনি বললেন, 'আমি দান গ্রহণ করি না। কারণ, আমি চাকরি করে যা মাইনে পাই তাতে আমার চলে যায়। আর কী দরকার!'

অনেক টাকা রোজগার করতেন বলে কখনও নিজের বা পরিবারের জন্য ন্যূনতমের বেশি ব্যয় করেননি। বরং অন্যদের দিয়েছেন অকাতরে। নিজের জন্য সামান্য ধুতি-চাদর ছাড়া আর কোনও চাহিদা ছিল না তাঁর। এর বেশি নিতে তাঁর বিবেকে বাধত। বর্ধমানের মহারাজা আরেকবার বিদ্যাসাগরকে বীরসিংহ গ্রাম এবং তার সংলগ্ন এলাকা 'তালুক' হিসাবে দান করতে চাইলেন এবং বিদ্যাসাগর যেন অবশ্যই গ্রহণ করেন, এমন আবেদন জানালেন। বিদ্যাসাগর তখন তাঁকে বললেন, "আমার যখন এমন অবস্থা হবে যে, সমস্ত প্রজার খাজনা আমি নিজে দিতে পারব, তখন আপনার তালুক গ্রহণ করব।" বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর বলতে চেয়েছেন, একা ভোগ করতে চাই না। অগণিত মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাবে আর আমি একা বিলাস করব, এ হয় না। এমনই বিরল আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি।

এই আত্মমর্যাদাবোধ কোনও মিথ্যা অহংকারের জন্ম দেয় না। ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের ভিত্তিতে কাউকে ছোট মনে করতে শেখায় না। কায়িক শ্রমকে অসম্মানের মনে করতে শেখায় না। তাই বিদ্যাসাগর পদমর্যাদায় উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকলেও অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র মানুষের মধ্যে। অনায়াসে হয়ে উঠতে পারতেন তাদের একান্ত আপনজন। একদিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন, বিদ্যাসাগর এক মুদি দোকানের সামনে রাস্তায় বসে তামাক খাচ্ছেন, আর গল্প করছেন। পরে দেখা হলে বিদ্যাসাগরকে সমালোচনাচ্ছলে তিনি বলেন, 'আপনি এইসব লোকেদের সঙ্গে মেশেন কেন?' উত্তরে বিদ্যাসাগরের উক্তি বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'দ্যাখো, ওদের নিয়েই আমাদের ঘরকন্না, ... রাজা-মহারাজাদের নিয়ে তো আমাদের ঘরকন্না নয়। ... তোমাদের ছাড়তে পারি, কিন্তু ওদের ছাড়তে পারি না।'

মিথ্যা অহংবোধের বিরোধী ছিলেন বিদ্যাসাগর। এ বিষয়ে যাকে যেভাবে সতর্ক করা সম্ভব, সেটা করতেন তিনি। একবার রাতে কলকাতা থেকে বীরসিংহে ফিরছেন তিনি। পরদিন সকালে গ্রামে একটা অনুষ্ঠান আছে। রাতে রেল স্টেশনে নেমেছেন। দেখলেন এক হ্যাট-কোট পরা বাবু কুলির খোঁজ করছেন এবং সাধারণ ধুতি-চাদর পরা বিদ্যাসাগরকেই কুলি ঠাউরে হাঁকাহাঁকি শুরু করলেন। বিদ্যাসাগর কিচ্ছু না বলে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন বাবুটির সাথে রয়েছে একটিমাত্র সুটকেস। তিনি সুটকেসটি নিয়ে পিছু পিছু চললেন। যেতে যেতে শুনলেন বাবুটি এখানে এসেছে বিদ্যাসাগরকে নিজে দেখতে। পরদিন সকালের সেই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের পরিচয় পেয়ে বাবুটি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইল। বিদ্যাসাগর তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'মোট বইলে মান কমে না। বরং নিজের কাজ নিজে করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।' এ জিনিস বিদ্যাসাগর নিজে সর্বক্ষণ চর্চা করতেন। একবার বীরসিংহ গ্রামে স্কুল করার জন্য নিজেই কোদাল নিয়ে আগাছা সাফ করে জমি তৈরি করেছিলেন তিনি। এভাবে প্রয়োজনীয় কাজের প্রতি জীবনে কখনও তাঁর অনীহা জন্মায়নি।

টেবিলে পা তুলে এক ইংরেজ সাহেবের উদ্ধত আচরণের জবাবে বিদ্যাসাগরের তেজোদীপ্ত আচরণ কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ইতিহাস বহুল প্রচলিত। কোথা থেকে আসে এই তেজ? এই দৃঢ়তা-নির্ভীকতা আসে সত্যের অমোঘ শক্তি থেকে। এই তেজ আসে সমাজের নিপীড়িত মানুষের জন্য কিছু করার আপ্রাণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। এই তেজ হল সত্যনিষ্ঠার তেজ।

সেকালের বহু ইংরেজিশিক্ষিত লোক ইংরেজভক্ত হয়ে গর্ব বোধ করত। দেশের মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। ইংরেজ কর্তাদের দেওয়া উপাধি-খেতাবের জন্য লালায়িত হত। বিদ্যাসাগর এই হীনতা-নীচতার শুধু বিপরীত ছিলেন তাই নয়, এসব মেরুদণ্ডহীনতাকে তীব্র ধিক্কার জানাতেন। কোনও উপাধি-খেতাবের পরোয়া করতেন না তিনি। ১৮৮০ সালে সরকার তাঁকে যেচে সিআইই ('কম্প্যানিয়ন অফ ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' অর্থাৎ ভারত সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ শাসকদের সাথী) উপাধি দিয়েছিল। কিন্তু ওই উপাধি পাওয়ার কথা আগে জানতে পেরে তিনি কলকাতার বাইরে চলে যান, যাতে ওই ঘৃণ্য পদক নিতে না হয়। কিছুদিন পর তিনি কলকাতায় ফিরে এলে কর্মচারী ও চাপরাশি দিয়ে তাঁর বাড়িতে পদক পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু বকশিসের আশায় কর্মচারীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিদ্যাসাগর বললেন, 'আমি একটা কথা বলি, তাতে আমারও সুবিধে, তোমাদেরও সুবিধে। এই পদকখানা নিয়ে বাজারে কোনও বেনের দোকানে বেচে দাও। যা পাবে দুজনে ভাগ করে নিও।' এই ছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে অর্থকষ্টে ভুগছেন তখন তাঁর বন্ধু হ্যালিডে সাহেব তাঁর জন্য হিন্দু কলেজে (এখন প্রেসিডেন্সি) একটি পদ তৈরি করে তাঁকে চাকরি দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সম্মতি দেননি। কারণ, তিনি জেনে গিয়েছিলেন, নতুন পদের প্রয়োজন ওখানে নেই। কেবল তাঁকে চাকরি দেওয়ার জন্য অমনটা করার কথা ভেবেছেন হ্যালিডে। তাঁকে কেউ অনুগ্রহ করবে, এ কখনও মেনে নিতে পারেননি বিদ্যাসাগর। তাই, বিধবাবিবাহ আন্দোলনে যখন আর্থিক দিক থেকে তিনি প্রায় নিঃস্ব তখন কয়েকজন মিলে বিদ্যাসাগরকে না জানিয়ে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সে বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগরের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। এ খবর পাওয়া মাত্র বিদ্যাসাগর ওই বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করতে বলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, আমি যা করেছি, আমার বিবেকের ডাকে করেছি। সেজন্য অন্য কাউকে দায়ভার নিতে হবে না। দেশের মানুষের যদি বিবেক থাকে তাহলে সমাজের স্বার্থে তারা নিজেরাই এগিয়ে আসবে।

আদর্শগত কারণে বিদ্যাসাগর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন একাধিকবার। তিনি বলতেন, 'যেখানে মর্যাদা নেই, কাজ করার স্বাধিকার নেই, এমন জায়গায় আমি কাজ করতে পারব না।' সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত যখন কথা দিয়েও সহকারি সেক্রেটারি হিসাবে বিদ্যাসাগরের পাঠক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন না, তখন প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর খুবই আর্থিক সংকট চলছিল। রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরের পরিচিত একজনকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'চাকুরি যে ছেড়ে দিল, চলবে কী করে?' সে কথা শুনে বিদ্যাসাগর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে চাকুরিতে সম্মান নেই, সে চাকুরি করবে না।' দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি ব্রিটিশের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু সাহায্য পাওয়ার জন্য ব্রিটিশের কোনও অন্যায়কে রেয়াত করেননি, স্পষ্ট ভাষায় তীব্র সমালোচনা করেছেন। পরিণামে অনেকে তাঁকে ভুল বুঝেছেন কিন্তু যাঁরা তাঁকে এতটুকুও বুঝেছেন, তাঁদের কাছে তাঁর কদর ছিল অতুলনীয়। আগে থেকে সময় না নিয়ে সে কালের ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন নামমাত্র কয়েকজন। সেই কয়েকজনের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম। ১৮৭৪ সালে হিন্দি কবি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ নামক এক যুবকের সাথে বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘর দেখতে গিয়েছিলেন। সঙ্গী দুজনের কোট-প্যান্ট-বুট পরা ছিল। ফলে তারা মূল ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন। বিদ্যাসাগরকে দারোয়ান আটকাল। কারণ তাঁর পায়ে বুট নেই, চটি। দারোয়ান বলল, নিয়মানুসারে চটি খুলে আপনাকে ভিতরে যেতে হবে। বিদ্যাসাগর সেভাবে যেতে রাজি হলেন না। কারণ, বুট পরে ঢোকা যায় অথচ চটি পরে যায় না— এর মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ শাসকের জাতিদম্ভ। নিজেকে বড় আর অপরকে ছোট মনে করার হীন মানসিকতা। তিনি বাইরে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন সঙ্গীদের ফেরার অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে সোসাইটির সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র ঘোষের কাছে পৌঁছেছে খবরটা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে চটি পরেই ভিতরে আসতে অনুরোধ করলেন। অন্য যে-কেউ হলে তখন ভিতরে চলে যেতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর গেলেন না। বরং তাঁদের দেখালেন, আমি উচ্চপদাধিকারী লোক বলে কোনও বিশেষ সুবিধা চাই না। যেদিন সকলের জন্য এক নিয়ম চালু হবে সেদিনই ভিতরে যাব।

বিদ্যাসাগরের জীবনের এই অনন্য সাধারণ ইতিহাস আমাদের শেখায়, যথার্থ আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে ওঠে অগণিত মানুষের কল্যাণের জন্য আপসহীন লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই। পার্থিব মানবতাবাদের বলিষ্ঠ প্রতিভূ বিদ্যাসাগর চরিত্র আজও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে নতুন সমাজের পথ দেখায়।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

এন আর সি রুখতে গঠিত হল নাগরিক কমিটি

এনআরসি-র নামে নাগরিকত্ব হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ৪ নভেম্বর মৌলালি যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল নাগরিক কনভেনশন। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুজাত ভদ্র প্রমুখ। বিমলবাবু বলেন, 'নাগরিক পঞ্জি তৈরি করার প্রক্রিয়া ভ্রান্ত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ধর্মীয় গন্ধযুক্ত। আমাদের আন্দোলন এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। নাগরিক আইনে যে সংশোধনী আনছে তা নিন্দনীয়'। প্রতুলবাবু বলেন, 'আসামে কোনও এনআরসি হয়নি, যা হয়েছে তা এনআরসি-র নামে আইনের বিকৃতি। এই এনআরসি মানি না। আমাকেই কেন প্রমাণ করতে হবে, আমি ভারতের নাগরিক'?

সুজাতবাবু বলেন, 'আমরা নাৎসি ক্যাম্পের কথা জানি, ভারতবর্ষে সেই ক্যাম্প করা হচ্ছে। দেশভাগের জন্য সাধারণ মানুষ দায়ী নয়। কাউকে রাষ্ট্রহীন না করে স্বাভাবিকভাবে নাগরিকত্ব দিতে হবে'। এন আর সি আতঙ্কে আত্মহত্যাকারী বসিরহাটের কামাল হোসেন মণ্ডলের বিধবা স্ত্রী মঞ্চে এসে তাঁর পরিবারের দুর্দশার কথা বলেন। কনভেনশনে দাবি ওঠে ১) এনআরসি প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে, ২) অবিলম্বে আসামে অমানবিক ডিটেনশন ক্যাম্প বন্ধ করতে হবে, ৩) এনআরসি-র কারণে আসামে এবং এ রাজ্যে যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন তাদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উপচে পড়া ভিড়ে ঠাসা কনভেনশন থেকে 'সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি' গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন বিমল চ্যাটার্জি, অন্যতম সহসভাপতি হয়েছেন সুজাত ভদ্র এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন গোপাল বিশ্বাস। কনভেনশনে এই আন্দোলনকে দ্রুত জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত

সাম্প্রদায়িক মতলবে বিজেপি সরকারের আনা নাগরিকত্ব হরণকারী এনআরসি প্রতিহত করতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩ নভেম্বর জলপাইগুড়িতে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শুভ্রাংশু চাকীকে সভাপতি ও সামশের আলিকে সম্পাদক করে ২৬ জনের নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

ঝাড়খণ্ডে ধরনা

আর্থিক সংকট, বেরোজগারি, আদিবাসী ও বনবাসীদের অধিকার হরণের প্রতিবাদে ২১ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে রাজভবনের সামনে ধরনায় জনসমাবেশের একাংশ

ভারত পেট্রোলিয়াম বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি তুলল এসইউসিআই(সি)

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটি ৩০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে ভারত পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (বিপিসিএল) বেসরকারিকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মহারত্ন' বলে আখ্যায়িত লাভজনক সংস্থা বিপিসিএলকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের ২৫ শতাংশ বাজার এই সংস্থার হাতে। এই সংস্থার রয়েছে চারটি শোধনাগার, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৬ হাজার একর জমি, ১৪,৮০২টি পেট্রোল পাম্প, ৫৯০৭টি এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার এবং ১১টি সহায়ক কোম্পানি।

এই কোম্পানির ৮ লক্ষ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে বিক্রি হতে যাচ্ছে মাত্র ৫৬ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে। এক লক্ষাধিক মানুষ সারা দেশে জীবন-জীবিকার জন্য এই কোম্পানির উপর নির্ভরশীল।

পেট্রোপণ্যের বাজার এভাবে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দিলে পেট্রোপণ্যের মূল্য ব্যাপক বাড়বে এবং তার ফলে সব জিনিসেরই দাম বাড়বে। মোদি সরকারের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ জনস্বার্থবিরোধী এবং প্রকাশ্য দিবালোকে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের লুঠ ছাড়া কিছু নয়। এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্ত থেকে অবিলম্বে সরে আসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। জনগণের কাছে কমিটির আবেদন, বেসরকারিকরণের এই পদক্ষেপ প্রতিহত করতে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলুন।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে সিলিন্ডার প্রতি ৭৬ টাকা। প্রতিবাদে ২ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে হলদিয়া-মেছেদা রাজ্য সড়ক অবরোধ এস ইউ সি আই (সি)-র। প্রতীকী গ্যাস সিলিন্ডারে অগ্নিসংযোগ করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মানিক মাইতি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রণব মাইতি।

হায়দরাবাদে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানালেন দেশের বিশিষ্টজনেরা

শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ, পণ্যায়ন ও সাম্প্রদায়িকীকরণের নীল নক্সা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আগামী ২৬-২৯ নভেম্বর হায়দরাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এআইডিএসও-র নবম সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন। এই ছাত্র সম্মেলনের আহ্বান ইতিমধ্যেই দেশের ছাত্রসমাজের মধ্যে বিপুল আলোড়ন তৈরি করেছে। এই সম্মেলনের মূল দাবি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সর্বনাশা শিক্ষা নিধনকারী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে এআইডিএসও-র প্রতি গভীর প্রত্যাশার কথা জানিয়ে সম্মেলনকে সর্বতোভাবে সফল করার উদ্দাত্ত আহ্বান তাঁরা দেশবাসীর কাছে জানিয়েছেন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার ও প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত থেকে ও বক্তব্য রেখে বহু বিশিষ্টজন তাঁদের সমর্থন জানাবেন। পাশাপাশি একটি আবেদনপত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা এই আহ্বান দেশবাসীকে জানাচ্ছেন। এঁরা হলেন, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ইরফান হাবিব, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস দেবপ্রিয় মহাপাত্র, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ডি এন ঝা, কর্ণাটক সরকারের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল অধ্যাপক রবিবর্মা কুমার, নিমহানস বাঙ্গালোরের প্রাক্তন ডিরেক্টর অধ্যাপক ভবানীশংকর দাস, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডি পি সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, বিশিষ্ট সমাজকর্মী অধ্যাপক রাম পুনিয়ানি, পদত্যাগী আইএএস কান্নান গোপীনাথ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন প্রধান মহীদাস ভট্টাচার্য, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অনীশ রায় সহ বহু বিশিষ্ট জন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com